ঃ পত্রিকা যোগাযোগ ঃ
রাজা রাউত (জলপাইগুড়ি)-৯৪৭৪৪১৭১৭৮
তুহিন শুভ্র মন্ডল (বালুরঘাট)-৯৪৭৫৯৩১২৯০
অভিজিৎ অধিকারী (ঢাকদহ)-৯৭৪৯৪৮৬৬৪৯
ময়ূখ ব্যানার্জী (কোচবিহার)-৯৪৭৪৮৩১০৮৬
সৌম্যকান্তি জানা (কাকদ্বীপ)-৯৪৩৪৫৭০১৩০
সুরজিৎ দাস (কাঁচরাপাড়া)-৯৪৩২৬৮৬৫১০
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় (ত্রিবেণী)-৯৪৭৭০৬৪৭০৪

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ পত্রিকা যোগাযোগ ঃ
অমিত কুমার নন্দী (চুঁচুড়া)-৯৪৩৩৯০৬৬২৩
বিবর্তন ভট্টাচার্য্য (নদীয়া)-৯৪৩৪১১০৯৬৯
গ্রাহক মূল্য : বার্ষিক ১০ টাকা,
যোগাযোগ ঃ বিজ্ঞান অন্বেষক, প্রযত্নে : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড,(বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া-৭৪৩১৪৫ উত্তর ২৪ পরগণা।

বর্ষ-৮ সংখ্যা - ১ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী / ২০১১ RNI No. WBBEN/03/11192

বিশেষ স্বাস্থ্য প্রবন্ধ

অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা

সারা বিশ্বে জুড়ে অস্তিত্ববান এমন কিছু রোগ ও অসুখের উপসর্গ আছে, যার প্রবল প্রকোপ, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা। যেমন—কুষ্ঠ, পোলিও, পুষ্টিজনিত সমস্যার মধ্যে লোহার অভাব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের দেশগুলি বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এই সমস্যা ব্যাপক। লোহার অভাবের কারণ মূলতঃ সুষম খাদ্যের অভাব। ভারতবর্ষের মানুষের খাদ্যগ্রহণ বড়ই বিচিত্র। প্রাকৃতিক পরিবেশ, ধর্মীয় নিদান, কুসংস্কার ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গি খাদ্য গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গিকে সব সময় খাদ্য গ্রহণের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে; তাই গরীব মানুষেরা খাদ্যাভাবের জন্য অপুষ্টিতে ভোগেন। এর সাথে যুক্ত হয় অশিক্ষার প্রভাব। খাদ্য বস্তু ও তার খাদ্য গুন সম্পর্কিত স্বাস্থ্যসম্মত জ্ঞানের অভাবেও হাতের নাগালের মধ্যে থাকা লৌহঘটিত খাবার নিছক অজ্ঞতার কারণে

এরপর 2 পাতায়

ভারতীয় উপমহাদেশের পাখি

বসন্ত বৌরি

বসন্ত বৌরি অতি পরিচিত নাম। সুস্পষ্ট গোঁফ (Barb) থাকার জন্য এদের Barbet বলে। সারা ভারতবর্ষ জুড়েই এদের বিভিন্ন প্রজাতি দেখা যায়।

BARBET (বসন্ত বৌরি) ORDER : PICI FORMES, FAMILY : MEGALAIMIDAE

(১) BLUE THROATED BARBET (MEGALAIMA ASIATICA) বসন্ত বৌরি নিলকান্ত বসন্ত, দৈর্ঘ্য-২০ সেন্টিমিটার Field Characters: নীল গলা ও গাল। মাথার উপরে ঠোঁট থেকে ঘাড় পর্যন্ত লাল। এর মাঝখানে একটি চওড়া কালো ডোরা আছে। চোখের উপরে একটি কালো রেখা গালের নীল রং থেকে লাল অংশটিকে আলাদা করেছে। গলার দুদিকে ছোট দুটি লাল ছোপ আছে। বাকি দেহটি সবুজ। সব বসন্ত বৌরির লেজটি তুলনামূলক ছোট হয়, এবং ঠোঁটটি বড় শঙ্কু আকৃতির হয়।

এরপর 7 পাতায়

পান্ডা

এক সংকটময় জীব

পান্ডা পৃথিবীর একটি বিচিত্রতম প্রাণী। রেকুন (Racoon-Procyonidae) পরিবারের সদস্য হিসেবেই ইদানিংকালে মর্যাদা লাভ করেছে পান্ডারা। ইতি পূর্বে পান্ডাকে 'Teddy Beat' নামে ভালুক পরিবার (Ursidae) এর সদস্য হিসেবেই ধরা হত।

পৃথিবীতে পান্ডার মূলত দুটি

এরপর 4 পাতায়

কিডনী

পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। আমাদের শরীরের মোট ওজনের ৭০ শতাংশই জল। একটা হিসাবেই বোঝা যায় যে আমাদের শরীরের জন্য জলকতটা অপরিহার্য। আমাদের দেহরূপী জটিল কলকব্জাযুক্ত মেশিনটাকে চালানোর জন্য দৈনিক প্রায় ১৭৮ লিটার জল দরকার। কিন্তু ঐ পরিমাণ জল আমরা পান করতে পারি না। আর তা আমাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। তাহলে উপায়? উপায় আছে। প্রকৃতিই আমাদের শরীরে তার ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমাদের তলপেটের পেছনদিকে রয়েছে দুটো কিডনী বা বৃক্ক। দেখতে

এরপর ৪ পাতায়

অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা.....

1 পাতার পর

মানুষ খায় না; ফলস্বরূপ অপুষ্টি ও তৎসম্পর্কিত উপসর্গ সমূহ আমাদের মধ্যে দেখা যায়।

মানবদেহে যে সমস্ত মৌল থাকে তার দিকে একবার চোখ বোলানো যাক। শতকরা হিসেবে উপস্থিত অক্সিজেন ৬৫%, কার্বন১৮%, হাইড্রোজেন ১০%, নাইট্রোজেন ৩%, ক্যালসিয়াম ২%, ফসফরাস ১.১%। এরপর কিছু মৌল আছে যেগুলো শতাংশের হিসেবে সকলেই একের নিচে। যেমন পটাসিয়াম ০.৩৫%, সালফার ০.২৫%, সোডিয়াম ০.১৫%, ক্লোরিন ০.১৫%, ম্যাগনেসিয়াম ০.০৫%, লোহা ০.০০৪%, ম্যাঙ্গানিজ ০.০০০১৩%, আয়োডিন ০.০০০০৪ শতাংশ। লক্ষ্য করুন প্রথম যে ছয়টি মৌলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারাই দেহের ওজনের ৯৯ শতাংশই দখল করে বসে আছে। পরেরগুলি সব মিলিয়ে এক শতাংশেরও কম। এবং এখানেই শেষ নয় আরও অন্তত কুড়িটি মৌল আছে যাদের পরিমাপ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। যদিও এদের অস্তিত্ব মাঝে মধ্যে ধরা যায়। এদের মধ্যে আছে জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যাডমিয়াম, ব্রোমিন, বোরন, সেলিয়াম ইত্যাদি। লোহার পরিমাণ শরীরে মাত্র ০.০০৪% অর্থাৎ ওজন হিসেবে যা উপস্থিত মাত্র হাজার ভাগের চার ভাগ হিসেবে, তার অভাবেও সৃষ্টি হতে পারে অ্যানিমিয়া নামক রোগের একটি উপসর্গের।

অ্যানিমিয়াকে বাংলায় বলে 'রক্তাল্পতা'। রক্তাল্পতায় শরীরের রক্ত কমে যায়—এরকম একটা ধারণা আছে। কিন্তু সেটি ভুল। ভুল ধারনাটা হয়েছে বোধকরি 'রক্তাল্পতা' (রক্ত+অল্পতা) শব্দটাকে নিয়ে। আসলে রোগটার প্রকোপে পড়লে কিন্তু শরীরের রক্ত কমে যায় না বা অল্প থাকে না, কমে যায় রক্তের মধ্যে থাকা লোহিত কনিকা অথবা হিমোগ্লোবিন নামক শ্বসন সহায়ক রঞ্জন পদার্থের সংখ্যা অথবা দুটোই। মানুষের রক্ত রক্তরস ও রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত। রক্তকণিকা তিন ধরণের, তারমধ্যে লোহিত কণিকা একটি। 'হিম' নামক লৌহঘটিত রঞ্জক পদার্থ ও 'গ্লোবিন' নামক প্রোটিন দিয়ে গঠিত হয় 'হিমোগ্লোবিন'—যা লোহিত কণিকায় দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং যে জন্য রক্তের রং হয় লাল। একজন সুস্থ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ লোকের প্রতি ঘন মিলি মিটার রক্তে ৫০ লক্ষ ও একজন প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী লোকের প্রতি ঘন মিলি মি. রক্তে ৪৫ লক্ষ লোহিত কণিকা থাকে। লোহিত কণিকা রোজ স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের শরীরে কিছুটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আর সমপরিমাণে তৈরি হয়ে যায়। অর্থাৎ সুস্থ মানুষের রক্তের লোহিত কণিকা তথা হিমোগ্লোবিনের সংখ্যা সব সময় একটা নির্দিষ্ট মাত্রাতেই থেকে যায়। স্বাভাবিকভাবে, লোহিত কণিকার সাথে হিমোগ্লোবিনের সংখ্যা সাম্য অবস্থার তুলনায় ধ্বংস বেশি হলে বা তৈরি কম হলেই দেখা দেবে রক্তাল্পতা। তাই রক্তাল্পতা বন্ধ করতে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা সঠিক রাখতে হবে অথবা শরীরের রক্ত কোন কারণে বেশি মাত্রায় যাতে বেরিয়ে না যায়, তা বন্ধ করতে হবে। এটা করা যেতে পারে উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচনে এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা ও পরামর্শে।

হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্য দরকার লৌহঘটিত যৌগ আর লোহিত কণিকা তৈরিতে দরকার ভিটামিন 'বি'$_{১২}$ (সায়ানোকোবাল্‌মিন) ও ফোলিক অ্যাসিড। এদের কোন একটা ঘাটতি হলে এক এক ধরণের অ্যানিমিয়া হবে। আবার ভিটামিন 'বি'$_{১২}$ এর ঘাটতিতে যে অ্যানিমিয়া হবে, ভিটামিন 'বি'$_{১২}$ ও ফোলিক অ্যাসিড দুটোরই ঘাটতিতে অ্যানিমিয়া হবে অন্য ধরণের। আমাদের দেশে ভিটামিন 'বি'$_{১২}$ ঘাটতিজনিত রোগীর সংখ্যা খুবই কম। যেটা বেশি দেখা যায়, তা হল লোহার ঘাটতিজনিত অ্যানিমিয়া এবং ফোলিক অ্যাসিড ঘাটতিজনিত অ্যানিমিয়া। তবে প্রকোপ সবচেয়ে বেশি প্রথমটির।

ভারতীয় উপমহাদেশ সহ পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ (সব বয়সের স্ত্রী-পুরুষ) লোহার অভাবজনিত পৌষ্টিক রক্তাল্পতার শিকার। গর্ভাবস্থায় এটি সাধারণ ও গুরুতর অসুখ। গর্ভস্থ শিশু তার দেহের গঠন ও বৃদ্ধির জন্য পুষ্টি সংগ্রহ করে মায়ের শরীর থেকে। তাই এই সময় মায়ের স্বাভাবিকের থেকে অতিরিক্ত পুষ্টির দরকার হয়। না হলে মা অপুষ্টি ও রক্তাল্পতায় ভুগবেন। এছাড়া আমাদের দেশের যে সব মেয়েরা সাধারণত অপুষ্টি ও রক্তাল্পতার শিকার হোন, গর্ভাবস্থায় তা বেড়ে যায়। এর প্রতিকারের জন্য ভাবী মাকে উপযুক্ত খাবার ও নিয়মিত লোহা ও ফোলিক অ্যাসিড গ্রহণ করে যেতে হবে। প্রতিদিন শরীরে লাল কণা ও হিমোগ্লোবিন ধ্বংস হয়ে যে যৌগ পাওয়া যায় সেটাই আবার নতুন হিমোগ্লোবিন তৈরিতে ব্যবহার হয়। যেটুকু লোহার লবন শরীর থেকে বের হয়ে যায় (প্রায় ১ মিলি গ্রাম) তা স্বাভাবিক খাবার থেকে পুষিয়ে যায়। মহিলাদের ঋতুস্রাবের সময়, গর্ভধারণের সময় বা ঘন ঘন সন্তান প্রসবকালে, যেকোন মানুষের নিয়মিত অর্শপাতে, নানা ধরণের পেট খারাপে শরীর থেকে রক্তের সাথে হিমোগ্লোবিন তথা লোহা বেরিয়ে যায়। আমাদের শরীরে এক গ্রাম লোহা সঞ্চিত থাকে ভবিষ্যতে প্রয়োজনের জন্য। দেহ থেকে লোহা বেরিয়ে যাবার পর সঞ্চিত লোহার খরচ হতে থাকে। এই খরচ আরো দীর্ঘায়িত হলে হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণ বন্ধ হয়, দেখা দেয় রক্তাল্পতা। এছাড়া লোহার ঘাটতির আরেক কারণ হুক কৃমির প্রকোপ। এদের প্রভাবে গ্রামে গঞ্জে ছোট বড় বেশির ভাগ সুস্থ মানুষই রক্তাল্পতায় ভোগে। অধিকাংশ মানুষ মাঠে ঘাটে মলত্যাগ করে। মলের সাথে নির্গত হুক কৃমির ডিমের লার্ভা পায়ের চামড়া ভেদ করে রক্তনালী বেয়ে ফুসফুসে পৌঁছয়। সেখান থেকে কাশির সাথে শ্বাসনালী বেয়ে গলায় আসে। আর খাদ্যের সঙ্গে পাকস্থলী হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লি কামড়ে ধরে এরা রক্ত শোষণ করে আর রক্ত ক্ষরণ ঘটায়। পথে-ঘাটে, ক্ষেতে খামারে গ্রামের মানুষেরা খালি পায়ে হাঁটেন বলে এই রোগ তাদেরই বেশি। সাধারণ স্বাস্থ্য জ্ঞানের অভাবে এটি ঘটে থাকে।

এখন প্রশ্ন হল, যেকোন লোহা সমৃদ্ধ খাবার খেলেই কি রক্তাল্পতা থেকে অব্যাহতি পাবো? প্রতিদিন আমরা যেসব খাবার খাচ্ছি তার মধ্যেই কিছুটা পরিমানে লোহার লবনের অস্তিত্ব আছে। তবে এই খাবার খেলেই যে কাজে লাগবে তা নিশ্চিত নয়। আপনি কী ধরণের

এরপর 3 পাতায়

অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা.....

2 পাতার পর

খাবার খাচ্ছেন (আমিষ না নিরামিষ) তার ওপরেই নির্ভর করছে ওই লোহা শরীরে গৃহীত হবে কিনা। আমাদের প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ মিলি গ্রাম লোহার দরকার। খাবারে যে লোহা থাকে তা দু'ধরণের। একটি 'হিম' গোত্রের আর অন্যটি 'নন হিম' গোত্রের। 'হিম' গোত্রের লোহাই (যা হিমোগ্লোবিন তৈরিতে কাজে লাগে) শরীরে শোষিত হয়ে সহজে রক্তে মিশতে পারে। সাধারণত আমিষ জাতীয় খাবারে এগুলো মেলে। যেমন—মাছ, মাংস, ডিমের কুসুম, মেটুলি। এছাড়া হিমের বড় উৎস হিমোগ্লোবিন সরাসরি এদের থেকে পাচ্ছি। আবার যেসব খাবারের উৎস উদ্ভিদ, তাদের লোহার যৌগ হল 'নন হিম' গোত্রের। সবুজ শাকসব্জি, শস্যদানা, শুকনো ফল জাতীয় খাবার, গুড়, মুড়ি, চিড়ে ইত্যাদি সবেতেই যে হিম থাকে তা সাইটোজোম অণুর মধ্যে থাকে এবং এটি খাবার দাবারের ফাইটেট, অক্সালেট, কার্বোনেট বা খাদ্যতন্তুর জন্য অন্ত্রে শোষিত না হয়ে বেশির ভাগটাই মলের সাথে বেরিয়ে যায়। আমিষ খাবার থেকে যেখানে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ লোহা শরীরে শোষিত হয়, সেখানে নিরামিষ খাবার থেকে মাত্র ২ শতাংশ থোড়, কাঁচকলা নন হিম গোত্রের উদ্ভিদ খাবার। উপরন্তু এই দুটোতে যে পরিমাণ লোহা আছে তা অন্যান্য উদ্ভিদ খাদ্যের (যে সব খাবার রোজ খাই) চেয়ে অনেক কম। নীচের সরণী দেখলেই বুঝবেন। সুতরাং 'অ্যানিমিয়া হলে থোড়, কাঁচকলা খাও'—এই যে কথা, বাপ-মা-ঠাকুমার কাছ থেকে শুনতে শুনতে মনের মধ্যে একটা ধ্রুবসত্য হিসেবে মনের মধ্যে গেঁথে গেছে, তা একেবারেই ভুল। তাই রক্তাল্পতা ঠেকাতে নিয়মিত আমিষ খাবার খেতেই হবে। থোড়, কাঁচকলা বা নিরামিষ খাবারে হবে না। খাদ্য থেকে লোহা শোষণ নিয়মিত করতে হলে ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ খাবার (যেমন—পাতিলেবু, কমলালেবু, আমলকি, পেয়ারা, অঙ্কুরিত ছোলা, লঙ্কা, টমেটো ইত্যাদি) খেতেই হবে, না হলে হবে না। কারণ ভিটামিন 'সি' শরীরে লোহা শোষণে সাহায্য করে। চার থেকে ছয় মাস পর্যন্ত সব শিশুকে টানা মাতৃদুগ্ধ খাওয়াতে হবে। শিশুর প্রয়োজনীয় লৌহ ধাতব মাতৃদুগ্ধই মেটাতে পারে। মাতৃদুগ্ধে লোহার পরিমাণ খুব কম হলেও তার দুই-তৃতীয়াংশ অন্ত্র থেকে শিশুর দেহে সহজে শোষিত হয়।

খাদ্য প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, লৌহ সমৃদ্ধ বা মিশ্রিত খাদ্য খেলে সুস্থ মানুষদের দেহে রক্তাল্পতার প্রাদুর্ভাব ঠেকানো যায় কিন্তু আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা হয় না। এর জন্য দরকার আলাদা লৌহ সম্পূরক যেমন IFA ট্যাবলেট (Iron, Folic Acid)। গর্ভবতীদের এই বড়ি প্রতিদিন জরুরি। মুখে ওষুধ ব্যবহার করে রোগের উপশম না হলে মাংসপেশিতে ইঞ্জেকশনের সাহায্যে লোহা নিতে হবে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরী।

রক্তাল্পতা মানেই যে মারাত্মক রোগের কারণে হয়েছে, এই ভেবে দুশ্চিন্তা না করে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে বেশিরভাগে ক্ষেত্রে রোগ সেরে যায়। রক্তাল্পতা ভারতের একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা—যে সমস্যা নিয়ে মানুষ এখনও অন্ধকারে থেকে গেছে। ভারত সরকার লোহার যৌগ ও ফোলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবারের মাধ্যমে রক্তাল্পতা প্রতিরোধকল্পে এক বিশাল কর্মসূচী চালু করেছিল। নানা কারণে সেই কর্মসূচী ও প্রচার আজও বিশ বাঁও জলে।

প্রতি ১০০ গ্রামে আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যে লোহার তালিকা

কাঁচকলা	-	০.৬ মিলি গ্রাম
মুড়ি	-	৬.৬ মিলি গ্রাম
নটে শাক	-	২৫.৫ মিলি গ্রাম
শুকনো খেজুর	-	৭.৫ মিলি গ্রাম
গরুর দুধ	-	০.২ মিলি গ্রাম
কলা	-	০.৯ মিলি গ্রাম
আখরোট	-	৪.৮ মিলি গ্রাম
রুই মাছ	-	১.০ মিলি গ্রাম
চিংড়ি মাছ	-	৫.৩ মিলি গ্রাম
তপসে মাছ	-	১৫৯৭ মিলি গ্রাম
মুরগীর ডিম	-	২.১ মিলি গ্রাম
থোড়	-	১.১ মিলি গ্রাম
চিড়ে	-	২০.০ মিলি গ্রাম
সেদ্ধ চাল	-	১১.৪ মিলি গ্রাম
কাজু বাদাম	-	৫.০ মিলি গ্রাম
সয়াবিন	-	১১.৫ মিলি গ্রাম
আপেল	-	১.০ মিলি গ্রাম
বোয়াল মাছ	-	৬২.০ মিলি গ্রাম
শিঙ্গি মাছ	-	২.৩ মিলি গ্রাম
ইলিশ মাছ	-	২.১ মিলি গ্রাম
হাঁসের ডিম	-	৩.০ মিলি গ্রাম

—তুষার কান্তি গলুই, মোঃ- ৯৬৩৫৯৩১৩৬২

তথ্যসূত্র : ১) উৎস মানুষ-এপ্রিল '৮৫, ২) আমাদের বিজ্ঞান জগৎ-ষষ্ঠ বর্ষ ২-৩য় সংখ্যা, ৩) মা হওয়া কি মুখের কথা-ডাঃ সুব্রত সেন

পান্ডা.....

1 পাতার পর

প্রজাতিই এই মুহূর্তে বেঁচে রয়েছে—একটি 'Giant Panda (*Ailutopada melanoleuca*)' ও অপরটি 'Smaller Panda' বা 'Red Panda (*Ailurus tulgens*)'।

দৈত্যপান্ডা (Giant Panda)

'Giant Panda' ভারতে না পাওয়া গেলেও ব্রহ্মদেশের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে শুরু করে ব্রহ্মদেশ সংলগ্ন দক্ষিণ চিন প্রদেশের বাঁশ বনে আজও হাতে গোনা কয়েকটি সংখ্যায় তাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে চলছে।

সাম্প্রতিককালের WWF (World Wild Life Fund For Nature) এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে মাত্র ৪০-৫০টি 'Giant Panda' দক্ষিণ চিনের শুধুমাত্র কয়েকটি সীমিত জায়গায় পাওয়া যায়। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আরও কয়েকটি হয়তো বা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। যদিও IUCN (International Union for the conservation of Nature and Natural Resoures WWF এবং চিনা সরকার বদ্ধপ্রজনন (Captive Breading) এর মারফৎ এদের বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাকিটা ভবিষ্যতই বলবে। তবে বহু প্রচেষ্টার ফলে ইদানিং কালে দু'একটি ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া গেছে বা যাচ্ছে যা আমাদের কাছে আশার আলো।

দৈত্য পান্ডা পৃথিবীর একটি বিরলতম প্রাণী মূলতঃ বাঁশের উপর নির্ভরশীল এবং যা WWF -এর প্রতীকও বটে। এরা দিনের ১৬ ঘন্টাই খরচ করে খাওয়ার ব্যাপারে। দিনে ১২-১৫ কিলোগ্রাম কঁচি বাঁশ পাতা, কান্ড খেতে হয় এদের। তবে কখনও সখনও এক একজন ৩৮ কিলোগ্রাম পর্যন্ত খেতে পারে এই কচি বাঁশ।

দক্ষিণ চিনের সিচুয়ান, গাংসু, ও সান্‌ঝি প্রদেশে ৩৩টি সংরক্ষিত বনে প্রায় ১৬,০০০ বর্গ কিমি. জায়গা জুড়ে এদের দেখা যায়।

লাল পান্ডা (Red Panda)

লাল পান্ডাকে অনেক সময় 'Cat-Bear' ও বলে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে পাওয়া যায়। এরাও ভীষণ দূর্লভ এবং সংখ্যায় সীমিত। যেকোন ক্রান্তীয় স্তন্যপায়ী (Tropical Mammal) দের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এই সুন্দর প্রাণীটি।

এরা সাধারণতঃ হিমালয়ের প্রায় ৫০০০ ফুট এর উপরের উচ্চতায় বসবাস করে। মূলতঃ নেপাল, সিকিম, পার্বত্য পশ্চিমবঙ্গ (দার্জিলিং) থেকে শুরু করে পাহাড়ী ব্রহ্মদেশ (মায়ান্‌মার) এমনকি দক্ষিণ চিনের কিছু অংশে এদের দেখা মেলে।

এদের মুখ চ্যাপ্টা, খাড়া-খাড়া কানের ডগা ছুঁচানো, উজ্জ্বল বাদামী-লাল রঙের নরম লোমে ঢাকা শরীর। মুখ ও নীচের ঠোঁট সাদা। লেজে খয়েরি রিং আছে। মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য এক মিটার এবং ওজনে প্রায় চার কিলোগ্রাম। প্রধানত শিকড়, কচি পাতা, বুনোফল, কচি বাঁশের ডগা খেলেও পাখির ডিম পোকামাকড় এমনকি ছোট ছোট পাখি পর্যন্ত খায় এরা। দিনের বেলায় উঁচু গাছের ডালে কোন নিরাপদ জায়গায় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেও সন্ধ্যে পড়ার সাথে সাথে এরা গাছের থেকে মাটিতে নামে খাদ্যের অন্বেষণে। বড় জোর দুই বা তিনটি লাল পান্ডা মিলে তৈরি করে এক একটি পরিবার। বসন্তকালে সর্বাধিক দুটি বাচ্চা প্রসব করে এরা। সাধারণভাবে গাছের কোটরে কিংবা পাথরের খাঁজে এরা বাসা বানায় কোন নিরাপদ জায়গায়। এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা 'মা' কিংবা উভয়ের সাথে কাটায়, যতদিন পর্যন্ত না তারা স্বনির্ভর হচ্ছে। এরা খুবই লাজুক প্রকৃতির। সহজেই পোষ মানানো যায়। দৃষ্টি শক্তিও তেমন প্রখর নয়। যার জন্য এরা প্রায়শই শিকারীর হাতে শিকারে পরিণত হয়। এদের প্রাকৃতিক শিকারী বলতে মূলতঃ মেঘচিতা বা আমাচিতা (Clowded Leopard) কেই বোঝায়। তবে এদের সবচেয়ে বড় শত্রু মানুষ যারা অকারণে এদের আবাসস্থল ধ্বংস করে যাচ্ছে। আবার একই সাথে অন্ধবিশ্বাস ও কু-সংস্কারের বশবর্তী হয়ে এদের দেহাংশের লোভে অবাধে নির্বিচারে শিকারও করে চলছে।

সাম্প্রতিককালে (২০০৫-০৬) ডঃ সুনীতা প্রধান এর নেতৃত্বে ভারত বিখ্যাত তথ্য চিত্র (বন্যপ্রাণী) পরিচালক রমেশ বেদি ও তার কোম্পানীর পরিচালনায় 'চেরাব্ অব্ দা মিস্ট্' (Cherub of the Mist) নামক রেডপান্ডার উপর একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করা হয়। বস্তুতঃ এটাই পৃথিবীর প্রথম রেড পান্ডার উপর করা বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং যথেষ্ট তথ্যবহুল তথ্যচিত্র। যার জন্য পৃথিবী বিখ্যাত 'Green Oscar Award–2006' ও পেয়েছে এই তথ্যচিত্রটি।

সিকিম, নেপাল ও দার্জিলিং (পশ্চিমবঙ্গ) সংলগ্ন সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানের দুর্গম কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। দার্জিলিং এর পদ্মজা জুয়োলজিক্যাল পার্কের থেকে আনা রেড পান্ডার সাথে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়াস চলছে। ভবিষ্যত সাফল্য পাওয়া যাবে— অবলুপ্তির হাত থেকে হয়ত রাস্তা পাবে আরও একটি প্রাণী এই আশায়।

রাজা রাউত
জলপাইগুড়ি, সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, ৯৪৭৪৪১৭১৭৮

তথ্যসূত্র : ১)The Book of Indian Animals-S.H.Prater
২) ভারতে বন্যপ্রাণী ও অভয়ারণ্য—বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী

ছবি ঃ পার্থ বোস

রেড পান্ডা

‘মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য’

“আমার চোখ সেই মানুষকে দাও, যে কখনও দেখেনি সকালের সূর্য, শিশুর মুখ... যদি প্রয়োজন হয় আমার কোষগুলি নাও, তাদের বাঁচিয়ে রাখো, কোনও দিন এক নির্বাক বালক বাধা ভেঙ্গে চিৎকার করবে আর বধির মেয়েটি জানালার বাইরে বর্ষার রিমঝিম শব্দ শুনবে বলে।”— এই মানবিক আর্তি ছিল একজন মানুষের, বরাত এমটেস্টের।

আয়ুর্বেদের যুগ থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের পদক্ষেপ ‘দৈব ব্যপাশ্রয়ী ভেষজ’ থেকে ‘যুক্তি ব্যপাশ্রয়ী ভেষজ’-এর দিকে প্রসারিত। প্রত্যক্ষ, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে চিকিৎসাবিদ্যার তিন নতুন শাখা - অ্যানাটামি (শারীরস্থানবিদ্যা), ফিজিওলজি (শারীরতত্ত্ব) ও প্যাথলজি (বিকারতত্ত্ব)। ভারতবর্ষে অ্যানাটমি চর্চার শুরু হয়েছিল চরক, সুশ্রুতের আমলে। আয়ুর্বেদের আদিগ্রন্থ বলতে ‘চরক সংহিতা’ ও ‘সুশ্রুত সংহিতা’কেই বোঝায়। সুশ্রুত তাঁর গ্রন্থে শব ব্যবচ্ছেদের জন্য উপযুক্ত শব নির্বাচন পদ্ধতি এবং শব ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কিভাবে নিপুন শল্যবিদ হয়ে উঠবে তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে শব ব্যবচ্ছেদ করা একান্ত জরুরী। ‘ঋগ্বেদ’-এর যুগে বর্ণাশ্রমের প্রচলন হয়নি। ফলে চিকিৎসায় ও শল্যবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ বলে অশ্বিদয় বা নাসত্যদ্বয়ের প্রশংসাতে ঋগ্বেদ মুখর।

দ্বাদশ শতাব্দীর চিকিৎসাবিদ ইব্‌ন্ রুস্‌দ্-এর (১১২৬-১১৯৮ খ্রি) উপর বিরোধের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। ইব্‌ন্-এর মতবাদ তৎকালীন ধর্মীয় নেতাদের এতটাই রোষের কারণ হয়েছিল যে জন্মভূমি করডোভা থেকে তাঁকে নির্বাসিত হতে হয়। স্পেন থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলার জন্য প্রকাশ্য দিবালোকে, জনগনকে ইবনের অমূল্য গ্রন্থরাজি পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং আইন করে ইব্‌ন্-এর মতবাদের চর্চা নিষিদ্ধ করা হল।

শব ব্যবচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয়ে যাদের নাম করতে হয় তারা হলেন হিরোফিলাস, ইয়াসিসট্রেটাস, আল্‌ক্‌মাওন, হিপোক্রেটিস, ক্লডিয়াস গ্যালেন, আব্‌দ্ আল লতিফ, ভেসালিয়াস, মাইকেল সের্ভেটাস, রিয়ালদাস কলম্বাস, হিরোনিমাস ফ্যাব্রিসিয়াসো, উইলিয়াম হ্বিহার্ভি, জাঁ পেকে, রুডবেক, বার্থোলিন, গ্রিসেন, টমাস হোয়ার্টন। অধ্যাপকরা উচ্চাসনে বসে প্রামাণিক গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী শব ব্যবচ্ছেদের আদেশ দিতেন। অধস্তন কর্মীরা কাজটি করতেন। ভেসালিয়াস সেই রীতি তুলে দিয়ে অধ্যাপককে শব ব্যবচ্ছেদ টেবিলের কাছে গিয়ে নিজ হাতে ছুরি চালাতে বাধ্য করলেন। সাধিত হল জ্ঞানের সাথে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমন্বয়। শারীস্থান বিদ্যায় উৎকর্ষসাধনে চিকিৎসকদের ভূমিকা যতটা, শিল্পীদের অবদানও তার চেয়ে কম নয় (মাইকেলাঞ্জেলো, রাফায়েল, ডুয়ের, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি)।

১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের শব ব্যবচ্ছেদ শেখাবার প্রয়োজন হয়। শাস্ত্র অনুশাসন অগ্রাহ্য করে হিন্দু ছাত্রদের লাশকাটা ঘরে নিয়ে যাওয়াই ছিল অসম্ভব ব্যাপার। শেষমেশ এক ছাত্রকে রাজি করানো গেল। কিন্তু দুশ্চিন্তা চোখের ঘুম কেড়ে নিল সংগঠকদের। যাদের অন্যতম ছিলেন কলেজ সচিব ডেভিড হেয়ার, অধ্যক্ষ গুডিভ সাহেব, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ। অনিশ্চয়তার কালো মেঘ সরিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের বুকে সেদিন ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলেন কলেজেরই অন্যতম ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০-১৮৫৬) ও তাঁর সহযোগীরা। ভারতের বুকে এটাই ছিল কোনও ভারতীয়ের করা প্রথম শব ব্যবচ্ছেদের ঘটনা। তারিখটা ছিল ১০/০১/১৮৩৬।

আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স-এর বিজ্ঞানীরা এবং ইংল্যান্ডের বরাট নক্স ও তাঁর সহকর্মীরা তৎকালীন সমাজের আইনকে অস্বীকার করে শারীস্থানবিদ্যাকে উন্নত করার লক্ষ্যে চুরি করা শব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে থাকেন। ফলে পড়তে হয় রাষ্ট্রশক্তির কোপে। গবেষণাগার ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়। হেয়ার ও উইলিয়াম বার্ক চুরি করা ছেড়ে খুন করে ডাঃ নক্স-এর পাঠগৃহে মৃতদেহ জোগান দিতে থাকে। উইলিয়াম বার্ক ধরা পড়ে ১৮-২৯ সালে। খুন করে মৃতদেহ পাচারের অপারাধে প্রকাশ্যে ফাঁসি হয় বার্কের। বার্কের ফাঁসি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা। চিন্তাবিদ জেরেমি বেন্থাম মানব কল্যাণ তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ‘মরণোত্তর দেহদান’-এর অঙ্গীকার করেন। ১৮৩২ সালে বেন্থামের মৃত্যুর পর তাঁর নশ্বর দেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে লাগে।

জৈব প্রযুক্তির বিপুল বৈভব ও বাণিজ্যায়নের এই যুগে দাঁড়িয়ে আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি, বেন্থামের পক্ষে তা কল্পনা করা সহজ ছিল না। হার্ট, লিভার, কিডনি, কর্ণিয়া চামড়া প্রভৃতি দেহাংশ বা দেহাঙ্গের প্রতিস্থাপন এখন প্রায় সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু অঙ্গ প্রতিস্থাপনও এখন আর তেমন সাড়া জাগায়না। মানব প্রত্যঙ্গ কে অন্য কিভাবে কাজে লাগানো যায়, প্রায় প্রতিদিনই তার নানা সম্ভাবনাময় দিক আমাদের সামনে খুলে যাচ্ছে। ভ্রূণকোষকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে পার্কিনসন্‌স, ডায়াবেটিস বা অ্যালঝেইমার-এর মত রোগ প্রতিরোধ করা যায় তার উপায় ভাবতে শুরু করেছেন বিজ্ঞানীরা।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল ভিত্তিই হল

ক) শব ব্যবচ্ছেদের সহায়তায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের মৃত্যুর কারণ নির্ণয়।

খ) রোগের গতি - প্রকৃতি নির্ধারণ।

গ) চিকিৎসা চলাকালীন ঘটে যাওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান।

ঘ) জীবিত রোগীর দেহে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় দেহকলা সংগ্রহ।

চিকিৎসাবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিকারতত্ত্ব বা প্যাথলজি। প্যাথলজিকে বলা হয় গ্রামার অফ মেডিসিন। মূল ভিত্তিটাই প্রয়োগিক; আর এর জন্য প্রয়োজন হয় ময়নাতদন্তের।

এরপর 6 পাতায়

মানুষ মানুষের জন্য.....

5 পাতার পর

ময়নাতদন্ত দুই ধরণের ঃ—

১) প্যাথলজিক্যাল পোস্টমর্টেম - চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের গবেষণার কাজে লাগে। শব ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী ত্রুটি থেকে শিক্ষা নিয়ে আত্ম সংশোধনের সুযোগ পায় শিক্ষার্থী। ইউরোপে স্বাভাবিক মৃত্যুর পরও পোস্টমর্টেম বাধ্যতামূলক।

২) ফরেনসিক পোস্টমর্টেম - সন্দেহজনক মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন হয়।

মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার পাঠক্রমে বলা আছে, প্রত্যেক স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে দশটি প্যাথলজিক্যাল পোস্টমর্টেম ও সমসংখ্যক ক্লিনিকো প্যাথলজিস্ট কনফারেন্সে হাজির থাকতে হবে। বাস্তব হল, ভারতের অধিকাংশ মেডিক্যাল কলেজেই প্যাথলজিক্যাল পোস্টমর্টেম হয়না। কারণ বহুবিধ। মৃতদেহের অভাব, সংস্কার, শিক্ষক-ছাত্রদের অনিহা সর্বোপরি আমলাতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ফল হয় মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারি।

পৃথিবীর বহু দেশেই মরণোত্তর দেহদান আন্দোলন সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে। গুরুত্ব পেয়েছে। কুয়েত, জর্ডন, সৌদি আরবসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই আন্দোলন খুবই জনপ্রিয়। মহারাষ্ট্রেও তা ক্রমশক্তিসঞ্চয় করছে। পশ্চিমবঙ্গে বিগত কিছু বছরে কয়েকজন বিশিষ্টের মৃত্যু ও তাঁদের দেহদানের কল্যাণে মানুষের মধ্যে কিছু উৎসাহ বেড়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। কিন্তু তা প্রত্যাশিত উচ্চতায় পৌঁছতে পারছে কই?

না পারার কারণ অনেকগুলি। সরকারি সদিচ্ছার অভাব তো আছেই। সাথে আছে আত্মা, পরলোক, জন্মান্তরবাদ সম্পর্কীয় নানা বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা।

একদিকে মরণোত্তর দেহদান নিয়ে সরকারি প্রচারহীনতা, নিশ্চেষ্টতা প্রকট; অন্যদিকে যাঁরা মরণোত্তর দেহদানের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের দেহও মৃত্যুর পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাসপাতালে পৌঁছয়না। পরিবর্তে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কল্যাণে পুড়ে ছাই হয়। নতুবা পচে গলে মিশে যায় মাটিতে। কারণ মৃতদেহ নিয়ে আসার এবং সেই দেহ বা দেহযন্ত্র সংরক্ষণের কোনও পরিকাঠামো আমাদের সরকারি হাসপাতালগুলিতে নেই। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে মৃতদেহ হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া মৃতের পরিবারের পক্ষে সম্ভব হয়না। মৃতদেহ নিয়ে যেতে হবে শুনলেই হয় গাড়ির মালিক সংস্কারবশে বেঁকে বসে নয়তো উচ্চ দক্ষিণা দাবি করে। অ্যাম্বুলেন্স এখন মোটামুটি সহজলভ্য হলেও তাতে আবার মৃতদেহ তোলা হয়না। আবার মৃতদেহ বহনের জন্য ম্যাটাডোর ইত্যাদির ভাড়া যে সবাই দিতে পারবেন এমন নয়। আর্থিক অস্বচ্ছলতা গাড়ি ভাড়া না করতে পারার একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ রীতি অনুসারে মৃতদেহের সৎকার করলে পাড়া-প্রতিবেশীর চাঁদা তুলে যা হোক একটি ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য মৃতদেহ হাসপাতালে পৌঁছে দিতে চাঁদা তোলা? নৈব নৈব চ ঃ।

প্রতিদিন যত হাজার কর্ণিয়া শুধু তুলসিপাতা চাপা দিয়েই আমরা পুড়িয়ে ফেলি সেই সংখ্যাটিও নেহাত কম নয়। অথচ সেই কর্ণিয়াগুলো পাওয়া গেলে এবং যথামথভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে কত মানুষকেই না দৃষ্টি দেওয়া যেত। সেই সুখী মানুষটি হতে পারতেন আমাদেরই ঘরের কেউ। ঘটি-বাটি বেচে তাঁদের মাদ্রাজ কি হায়দ্রাবাদ নিয়ে যেতে হতনা। এখানেই সম্ভব হত সফল অস্ত্রোপচার। আমরা যদি আন্তরিক সততার সাথে বিশ্বাস করি, 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য' তাহলে কি সেই সুদিনের প্রত্যাশা করতে পারিনা?

—তপন চন্দ, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, মাদারিহাট, জলপাইগুড়ি। ফোন : ৯৭৩৩১৫৩৬৬১

(কৃতজ্ঞতা ঋণস্বীকার - বিজ্ঞান ও সমাজসেচনা, সম্পাদনা চিরঞ্জয় পাল, গৌর অধিকারী, বইমেলা সংরক্ষণ - ২০০১)

।। বিজ্ঞান-সংবাদ ।।

কোচবিহারে বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী

চতুর্থ বর্ষ বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী আয়োজন করল কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, নীলকুঠি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান ডেভলপম্যান্ট ও বিজ্ঞান অন্বেষক।

কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের হল ঘরে জেলার ২২টি স্কুলের ২০০ ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। জলাতঙ্ক রোগ, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, সাপ ও সাপের কামড়, বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে সমীক্ষাপত্র প্রশ্নপত্র আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

✷

বিজ্ঞান দরবার এর ২২ তম বার্ষিক সম্মেলন

২৮ নভেম্বর বিজ্ঞান দরবার সংস্থার ২২ তম বার্ষিক সম্মেলন কাঁচরাপাড়া অ্যালবাট্রস স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালে ৩১ অক্টোবর সংস্থার পথ চলা শুরু। সর্বস্তরে বিজ্ঞান চেতনার প্রচার ও প্রসার করার লক্ষ্যে ৩০ বছর ধরে সমাজে বিভিন্ন স্তরে জনমুখী কর্মসূচী বিজ্ঞান দরবার চালিয়ে আসছে। সম্মেলনের সম্পাদক বিজয় সরকার বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন। যে কর্মসূচীগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহল ১) মরণোত্তর দেহ দান ও চক্ষুদান আন্দোলন ও চক্ষু (কর্ণিয়া) সংগ্রহ অভিযান। ২) ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা কর্মসূচী। ৩) পরিবেশের বিভিন্ন দূষণ নিয়ে প্রচার কর্মসূচী। সম্মেলনে আগামী ১ বছরের জন্য ১১ জনের কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হন যথাক্রমে সুরজিত দাস ও ড. গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী।

পাখি.....

1 পাতার পর

পুরুষ ও স্ত্রী একই রকম দেখতে।

Distribution : পাকিস্তানের রাওলপিন্ডি থেকে শুরু করে ২০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত নিম্ন হিমালয় বরাবর অরুনাচল প্রদেশ, মনিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও মায়ানমারে এদের পাওয়া যায়।

Habits : আতা, পেঁপে, পেয়ারা সহ বিভিন্ন ফল এদের প্রিয় খাদ্য, তবে এরা ডানাওয়ালা উই পোকাও খায়। টু কারু–ক্ টুক্, টুকারু–ক্ টুক্ করে একটানা দীর্ঘ সময় ধরে ডেকে এরা নিজের এলাকা চিহ্নিত করে। সব বসন্ত বৌরির ডাকই কম বেশী একই রকম ও জোরালো, যা অনেক দূর থেকে শোনা যায়। একটানা ডানা না নেড়ে কয়েকবার দ্রুত ডানা নেড়ে ক্রমাগত ছোট ছোট বিরতি নিয়ে এরা ওড়ে।

Nesting : মার্চ থেকে জুন। সুপুরি, মাদার প্রভৃতি গাছ বা মৃত গাছের ডালে গর্ত করে এরা বাসা তৈরি করে। ৩ থেকে ৪টি সাদা ডিম পাড়ে। পুরুষও স্ত্রী উভয়ই সমস্ত কাজ একত্রে করে।

(২) GREAT BARBET (MEGALAIMA VIRENS) দৈর্ঘ্য- ৩৩ সেন্টিমিটার

Field Characters : ঠোঁট হলুদ, মাথা নীলচে কালো, বুক ও পিঠের উপরের দিক বাদামী। পিঠ থেকে লেজ পর্যন্ত বাকি অংশটি সবুজ। লেজের গোড়ায় নিচের দিকে লালচে ও হলুদ পেটের উপর সবুজ ছিট ছিট পালক আছে।

Distribution : হিমালয়ের ১০০০ - ৩০০০ উচ্চতায় এবং শীতকালে কিছুটা কম উচ্চতায় এদের দেখা যায়। এছাড়া রুনাচল প্রদেশ ও ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলেও এরা উপস্থিত।

Habits : একটি বড় ফলগাছে ৩০টিরও বেশী পাখি একত্রে ফল খায়। তবে একাকি বা জোড়ায় বসবাস করে।

Habits ঃ এপ্রিল - জুলাই।

(৩) BROWN - HEADED BARBET ZEYLANICA) দৈর্ঘ্য - ২৯ সেন্টিমিটার, বড় বসন্ত/ ফোকারে পাখি।

Field Character : মাথা বুক ও পিঠ বাদামা, বাকি দেহ সবুজ। বুকে ও পিঠে সাদা ছিট ছিট দাগ আছে। লেজের গোড়ার নিচের রং নীলাভ। ঠোঁট ও চোখের চারপাশ কমলা।

Distribution : উচ্চ হিমালয়, রাজস্থান, গুজরাট ও উত্তর-পূর্ব ভারত বাদে প্রায় সর্বত্রই এদের দেখা মেলে। উত্তরবঙ্গ ও শ্রীলঙ্কাতেও এদের বাস।

Habits : বট বা অশত্থ গাছে একসঙ্গে ২০টিরও বেশী পাখিকে ফল খেতে দেখা যায়।

Nesting : ফেব্রুয়ারী থেকে জুন।

(৪) LINEATED BARBET (MEGALAIMA LINEATA) দৈর্ঘ্য - ২৮ সেন্টিমিটার

Field Character : Brown-headed Barbet এর মতো। বুক ও পিঠের ছিট্ ছিট্ সাদা দাগগুলি আরও উজ্জ্বল ও বড়, ঠোঁটের নিচের অংশটি সাদা, ঠোঁট ও চোখের চারপাশের অংশ (Brown-headed Barbet এর থেকে ছোট) হলুদ।

Distribution : কুমায়ুন পর্বতমালা থেকে শুরু করে হিমালয় বরাবর অরুনাচল প্রদেশ পর্যন্ত, সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর উড়িষ্যা।

Habits : ফল ছাড়াও এরা নানা রকমেক পোকামাকড়, ছোট মেরুদন্ডী প্রাণী যেমন টিকটিকি, ব্যাঙ ইত্যাদি খায়।

Nsting ঃ মার্চ থেকে জুন।

(৫) WHITE - CHEEKED BARBET (MEGALAIMA VIRIDIS) দৈর্ঘ্য-২৩ সেন্টিমিটার

Field Characterers : মাথা ঘন বাদামী, গলা ও চোখের চারপাশ সাদা বুকে বড় বড় সাদা ডোরার মাঝে বাদামী রঙ দেখা যায়। বাকি দেহ সবুজ। চোখের পেছনে কাজলের মতো কালো ডোরা আছে।

Distribution : নর্মদা নদীর নীচ থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে চিরহরিৎ ও অর্দ্র বনভূমিতে এদের দেখা যায়।

Habits : একা বা জোড়ায় থাকে। বট বা অশত্থ গাছে অনেকে এক সাথে কলরব করে ফল খায়। কফি বীজ এদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য।

Nesting ঃ ডিসেম্বর থেকে জুন।

(৬) CRIMSON - FRONTED BARBET (MEGALAIMA RUBICAPILLA) দৈর্ঘ্য ১৭ সেন্টিমিটার

Field Characterers : কপাল, চিবুক, গলা ও বুকের উপরি ভাগ লাল। চোখের পিছনে অর্ধবৃত্তাকার চওড়া কালো ডোরা আছে। কালো ডোরার পিছনে নীল ডোরা এবং বুকের লাল রঙের নিচে হলুদ অংশ দেখা যায়। বাকি দেহ সবুজ। শ্রীলঙ্কায় লালের পরিবর্তে কমলা রঙ দেখা যায়।

Distribution : পশ্চিমঘাট পর্বতাঞ্চলে ১২০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ও শ্রীলঙ্কায় এদের বাসস্থান।

Habits : অন্যান্য বসন্ত বৌরির মতো।

Nesting : জানুয়ারী থেকে মার্চ

(৭) COPPERSMITH BARBET (MEGALAIMA HAEMACEPHALA) দৈর্ঘ্য - ১৭ সেন্টিমিটার, ভগীরথ।

Field Characters : কপাল ও গলা লাল। চিবুক ও চোখের চারপাশ বৃত্তাকার হলুদ। বুক ও পেটে হালকা হলুদের উপর সবুজ ডোরা দেখা যায়। বাকি দেহ সবুজ ও লেজটি খুবই ছোট।

Distribution : ১০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ভারতের প্রায় সর্বত্র, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা মায়ানমার ও পাকিস্তানে এদের দেখা মেলে।

Habits : অন্যান্য বসন্ত বৌরির মতো।

Nesting : জানুয়ারী থেকে জুন।

(৮) GOLDEN THRDATED BARBET (MEGALAIMA FRAKLINII) দৈর্ঘ্য - ২৩ সেন্টিমিটার।

Field Character : Blue-throated এর মতো। তবে লাল মাথায়

এরপর ৪ পাতায়

কিডনী.....

1 পাতার পর

অনেকটা বরবটির দানার মতো কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড়ো। আমাদের মুষ্টিবদ্ধ হাতের তালুর মতোই প্রায়। সেই কিডনীর এক একটাতে রয়েছে ১০ হাজার করে ছাঁকানী যাদের বলে নেফ্রন। আমরা রোজ যা জল

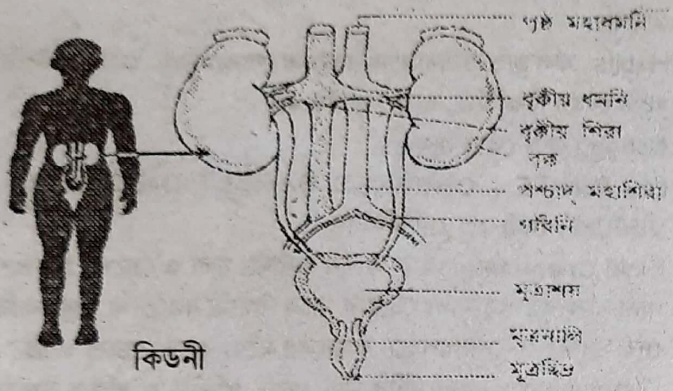

কিডনী

পান করি তা এই কিডনীর মাধ্যমে বার বার ছাঁকা হয়ে ঐ ১৭৮ লিটার জলের প্রয়োজন মেটায়। তার জন্য রোজ গড়ে ২ লিটার জল আমাদের দরকার। আমরা আমাদের প্রয়োজনের ৪০ শতাংশ জল সরাসরি পান করি বাকী ২০ শতাংশ জল আমরা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে গ্রহণ করি। শারীরবৃত্তিয় কাজগুলো যেমন পুষ্টি-বিপাক-সংবহন-রেচন ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য আমাদের রোজ ৮-১০ গ্লাস জল পান করা উচিত।

আমাদের শরীরে দুটো কিডনী থাকলেও এক সাথে দুটো কাজ করে না। একটা কিডনী 'রিজার্ভ' থাকে। যদি কোন কারণে একটা কিডনী অকেজো হয়ে যায় তখন অন্য কিডনিটা আপনা থেকে কাজ শুরু করে দেয়। এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। দ্বিতীয় কিডনীও যদি খারাপ হয়ে যায় তখন অতিরিক্ত উচ্চ রক্তচাপ, হাত পা ফুলে যাওয়া, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। দুটো কিডনী নষ্ট হয়ে গেলে কিডনী প্রতিস্থাপন করা ছাড়া পথ নেই। সাধারণত কিডনীর দুটো রোগের কথা বেশী শোনা যায়। একটা হচ্ছে কিডনীর পাথর আর অন্যটা নেফ্রাইটিস। আর এই নেফ্রাইটিস রোগেই কিডনী বেশী নষ্ট হয়। কিডনীর পাথর যদি প্রথম দিকে ধরা পরে তাহলে অনেক সময় জল বেশী খেলেই সেরে যায় সঙ্গে দু-একটা ওষুধও ডাক্তারের পরামর্শ মতো খেতে হয়। কিডনী নষ্ট হয়ে গেলে রেচনতন্ত্র সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে। শরীরের বিপাকজাত বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ বাইরে বেরোতে না পেরে সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সারা শরীর ফুলে যায় এবং মানুষ মারা যায়। দুটো কিডনী নষ্ট হয়ে গেলে অন্য সুস্থ লোকের কিডনী প্রতিস্থাপন করে সুস্থভাবে বাঁচা যায়। কিন্তু সেখানেও সমস্যা রয়েছে। প্রথমতঃ কিডনী প্রতিস্থাপন করা ভীষণ ব্যয় বহুল। দ্বিতীয়তঃ দাতার এবং গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ, Rh ফ্যাক্টর সহ বেশ কিছু বিষয় মিলতে হবে। নাহলে প্রতিস্থাপন করা ভীষণ ব্যয় বহুন। দ্বিতীয়তঃ দাতার এবং গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ আরএইচ ফ্যাক্টর সহ বেশ কিছু বিষয় মিলতে হবে। বিশেষতঃ গ্রহীতাকে ধোঁয়া - ধূলো থেকে দূরে থাকতে হবে। প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক ধূমপান করা চলবে না। খাওয়া দাওয়াতেও সতর্ক থাকতে হবে। অতিরিক্ত তেল মশলাযুক্ত খাবার খাওয়া যাবে না। নিয়ম করে খেতে হবে। তাছাড়া ডাক্তারের পরামর্শ মতো কয়েকটা ওষুধ দীর্ঘদিন খেতে হবে যা বেশ দামী এবং দুষ্প্রাপ্য।

অত ঝামেলার দরকার কি? কিডনী সুস্থ রাখলেই তো হলো। কিন্তু কিভাবে? খুব সোজা। পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিশ্রুত পানীয় জল পান করতে হবে। রঙীন খাবার এবং অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার যথাসম্ভব কম খেতে হবে। রঙীন খাবারের কৃত্রিম রঙ এবং অতিরিক্ত মিষ্টি ছাঁকতে কিডনীকে প্রচুর বাড়তি কাজ করতে হয় ফলে কিডনীর আয়ু কমে যায়। মিষ্টি খাবার পর প্রচুর জল পান করতে হয় নতুবা কিডনীর ওপর চাপ পড়ে। শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত যাতে ঘাম হয়। ঘামের সঙ্গেও শরীরের কিছু বর্জ্য পদার্থ বের হয়। তাতেও কিডনীর ওপর চাপ কমে। বিশেষ করে অতিরিক্ত নুন যা আমরা খাই তা ঘামের সঙ্গেই বাইরে বেরিয়ে আসে। কাজেই অতিরিক্ত নুনও খাওয়া যাবে না। লাল (বাসন্তী) , সবুজ, হলুদ রঙ করা খাবার, মিষ্টি, আইসক্রীম, আইস-বার, লজেন্স, ভেজাল হলুদ গুঁড়ো ভেজাল লংকা গুড়ো, সাধারণ মিষ্টি, এগুলো হল কিডনীর শত্রু। এ ধরণের খাবারের লোভ সামলাতে হবে। তবেই কিডনী সুস্থ ও সবল থাকবে।

—শঙ্কর নারায়ণ দাস, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম। ৯৬০৯৭৪২৯৯৭

পাখি.....

7 পাতার পর

কালোর পরিবর্তে হলুদ ডোরা থাকে। ঠোঁটের নিচে হলুদ ও বাকি গলার অংশ সাদা। ঠোঁট থেকে চোখ বরাবর চওড়া কালো ডোরা আছে।

Distribution : হিমালয়ের পাদদেশে, উত্তর পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশ।

(৯) BLUE-EARED BARBET (MEGALAIMA AUSTRALIS)

দৈর্ঘ্য ১৭ সেন্টিমিটার

Field Character : কানের পাশ ও গলা নীল। চোখের উপরে ও নীচে কালো ডোরা আছে যার শেষ অংশটি লাল।

Distribution : হিমালয়ের পাদদেশে, উত্তর পূর্বভারত ও বাংলাদেশ।

— কল্যাণ কুমার রায়, ফোন : ৯৪৩৩৫৭০৭০৪

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) E.mail-ganabijjnan@yahoo.co.in